"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যে জ্ঞানই পাও, তার উপর বিচার - সাগর মন্থন করো, এই জ্ঞান মন্থনেই অমৃত বের হবে"

***প্রশ্নঃ -** ২১ জন্মের জন্য লাভবান হওয়ার সাধন কি ?*

***উত্তরঃ -** জ্ঞান রত্ন । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে তোমরা যত জ্ঞান রত্ন ধারণ করো, ততই লাভবান হও । এখানের জ্ঞান রত্ন ওখানে হীরে - জহরত হয়ে যায় । আত্মা যখন জ্ঞান রত্ন ধারণ করবে, মুখ থেকে যখন জ্ঞান রত্ন নির্গত হবে, রত্নই শুনবে আর শোনাবে, তখন তার আনন্দিত চেহারায় বাবার নাম উজ্জ্বল হবে । আসুরী গুণ যখন দূর হবে তখনই লাভবান হতে পারবে ।

ওম্ শান্তি । বাবা তাঁর বাচ্চাদের জ্ঞান এবং ভক্তির উপর বোঝান । বাচ্চারা তো একথা বুঝতেই পারে যে, সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । সত্যযুগে জ্ঞানও পাওয়া যায় না । কৃষ্ণ না ভক্তি করতেন, না জ্ঞানের মুরলী বাজাতেন । মুরলীর অর্থ জ্ঞান দান করা । মহিমা তো আছে - মুরলীর জাদু । তাহলে অবশ্যই কোনো জাদু থাকবে, তাই না । কেবলমাত্র মুরলী বাজানো, এ তো সাধারণ কথা । ফকিররাও মুরলী বাজায় । এখানে তো জ্ঞানের জাদু । অজ্ঞানকে জাদু বলা হবে না । মানুষ মনে করে, কৃষ্ণ মুরলী বাজাতেন, তাই তাঁর মহিমা করে । বাবা বলেন যে, কৃষ্ণ তো দেবতা ছিলেন । মানুষ থেকে দেবতা আর দেবতা থেকে মানুষ, এ হতেই থাকে । দৈবী সৃষ্টিও যেমন হয়, তেমনই মনুষ্য সৃষ্টিও হয় । এই জ্ঞানেই মানুষ থেকে দেবতা হয় । সত্যযুগ যখন হয় তখন এই জ্ঞানের আশীর্বাদ হয় । সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । দেবতারা যখন মানুষ হয়, তখন ভক্তি শুরু হয় । মানুষকে বিকারী আর দেবতাকে নির্বিকারী বলা হয় । দেবতাদের সৃষ্টিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয় । তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছো । দেবতাদের মধ্যে কিন্তু এই জ্ঞান থাকবে না । দেবতারা সদগতিতে থাকেন, জ্ঞানের প্রয়োজন, দুর্গতিতে যারা থাকে, তাদের জন্য । এই জ্ঞানের দ্বারাই দৈবী গুণ আসে । জ্ঞানের ধারণা সম্পন্নদেরই চালচলন দেবতাদের মতো হয় । যাদের ধারণা কম, তাদের চলন মেলানো মেশানো হয় । আসুরী চলন তো বলা হবে না । ধারণা না থাকলে 'আমার সন্তান' কিভাবে বলা হবে ? বাচ্চারা যদি বাবাকে না জানে, তাহলে বাবা কিভাবে বাচ্চাদের জানতে পারবে । বাবাকে কতো খারাপ গালি দিয়ে থাকে । ভগবানকে গালি দেওয়া কতো খারাপ, কিন্তু যখন ওরা ব্রাহ্মণ হয়ে যায় তখন গালি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় । তাই এই জ্ঞানের বিচার - সাগর মন্থন করা উচিত । ছাত্ররা বিচার - সাগর মন্থন করে জ্ঞানের উন্নতি করে । তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো, এর উপর বিচার - সাগর মন্থন করলে অমৃতের নির্গমন হবে । বিচার - সাগর মন্থন না করলে কি মন্থন করবে ? আসুরী বিচার মন্থন করলে আবর্জনা বের হয় । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় ছাত্র । তোমরা জানো যে, বাবা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠ পড়াচ্ছেন । দেবতারা তো আর পড়াবেন না । দেবতাদের কখনোই জ্ঞানের সাগর বলা হয় না । বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । তাই নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমাদের মধ্যে সমস্ত দৈবী গুণ আছে কি ? যদি আসুরী গুণ থাকে, তবে তা দূর করে দেওয়া উচিত, তখনই তোমরা দেবতা হতে পারবে ।

তোমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছো । তোমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছো তাই পরিবেশও খুব সুন্দর তৈরী হওয়া উচিত । ছি - ছি কথা মুখ থেকে নির্গত হওয়া উচিত নয় । না হলে তোমাদের কম মানের বলা হবে । পরিবেশ দেখেই চট করে তা বুঝতে পারা যায় । মুখ থেকে দুঃখ দেওয়ার মতো কথাই বের হয় । বাচ্চারা, তোমাদের বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে । সর্বদা তোমাদের চেহারা আনন্দিত থাকা চাই । মুখ থেকে সর্বদা যেন রত্নই নির্গত হয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চেহারা কতো হাসিখুশী, এঁদের আত্মা জ্ঞান রত্ন ধারণ করেছিলো । এরা মুখ থেকে এই রত্ন নির্গত করেছিলো । এঁরা রত্নই শুনত এবং শোনাতো । তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত । এখন তোমরা যেই জ্ঞান রত্ন ধারণ করছো তাই প্রকৃত হীরে - জহরত হয়ে যায় । ৯ রত্নের মালা কোনো হীরে - জহরতের নয়, এই চৈতন্য রত্নের মালা । মানুষ কিন্তু ওই রত্ন মনে করে হাতে আংটি ইত্যাদি ধারণ করে । জ্ঞান রত্নের মালা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই তৈরী হয় । এই রত্নই ২১ জন্মের জন্য লাভবান করে দেয়, যা কেউই লুণ্ঠন করতে পারে না । এখানে ওই রত্ন ধারণ করলে চট করে কেউ লুণ্ঠন করে নেবে । তাই নিজেদের খুবই বুদ্ধিমান বানাতে হবে । আসুরী গুণকে দূর করতে হবে । আসুরী গুণের মানুষের চেহারাই এমন হয়ে যায় । তাদের মুখ ক্রোধে তো লাল তাওয়ার মতো হয়ে যায় । কাম বিকারের মানুষের মুখ তো একদম কালো হয়ে যায় । কৃষ্ণকেও তো কালো দেখানো হয় । বিকারের কারণেই গোরা থেকে কালো হয়ে গেছে । বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিটি কথার বিচার - সাগর মন্থন করা উচিত । এই পাঠ হলো অনেক সম্পদ অর্জনের পাঠ । বাচ্চারা,

তোমরা তো শুনেছো যে, রানী ভিক্টোরিয়ার উজির খুবই গরীব ছিলো । মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তো, কিন্তু ওই পড়া এমন কোনো রত্নই নয় । এই জ্ঞান অর্জন করে তোমরা উচ্চ পদ পেতে পারো । তাহলে এই ঈশ্বরীয় পড়া তো কাজে এলো, নাকি অর্থ ? এই ঈশ্বরীয় পাঠই হলো সম্পদ । সে হলো লৌকিক ধন আর এ হলো অসীম জগতের ঐশ্বর্য । তোমরা এখন বুঝতে পারো, বাবা আমাদের পড়িয়ে এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । ওখানে তো অর্থ উপার্জনের জন্য কেউ এই পড়া পড়বে না । ওখানে তো এখনকার পুরুষার্থে অগাধ সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় । সেই সম্পদ অবিনাশী হয়ে যায় । দেবতাদের কাছে কতো ধন সম্পদ ছিলো, তারপর বাম মার্গ, রাবণ রাজ্যে যখন আসে তখনো কতো সম্পদ থাকে । তাঁদের কতো মন্দির বানানো হয় । তার পরবর্তীকালে মুসলমানেরা সব লুণ্ঠন করে নেয় । দেবতারা কতো ধনবান ছিলো । আজকালকার পড়ায় এতো ধনবান হতে পারে না । তাহলে এই পড়ায় দেখো, মানুষ কি থেকে কি হয়ে যায় । গরীব থেকে বিত্তবান হয়ে যায় । এখন ভারতকে দেখো, কতো গরীব হয়ে গেছে । যারা নামে বিত্তবান, তাদের তো কোনো সময়ই নেই । নিজের ধন - সম্পদ এবং পদের কতো অহংকার থাকে । এতে অহংকার ইত্যাদি দূর হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন । আমরা হলাম আত্মা । আত্মাদের কাছে ধন - দৌলত, হীরে -জহরত আদি কিছুই নেই ।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করো । আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন এই বিত্ত ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যায় । তারপর যখন নতুন ভাবে পড়বে, অর্থ উপার্জন করতে পারবে তখন ধনবান হতে পারবে, অথবা অনেক দান - পুণ্য করলে বিত্তবানের ঘরে জন্ম নেবে । বলা হয়, এ হলো পূর্ব কর্মের ফল । জ্ঞানের যদি দান করে অথবা কলেজ - ধর্মশালা ইত্যাদি বানায়, তাহলে তার ফল পায় কিন্তু তাও অল্প সময়ের জন্য । এই দান - পুণ্য ইত্যাদিও এখানেই করা হয় । সত্যযুগে এমন করা হয় না । সত্যযুগে কেবল ভালো কর্মই হয়, কেননা আত্মা এখনকার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে । ওখানে কোনো কর্মই বিকর্ম হবে না, কেননা ওখানে রাবণ নেই। বিকারে গেলে কর্মও বিকারী হয়ে যায় । বিকার থেকেই বিকর্মের উৎপত্তি হয় । স্বর্গে কোনো বিকর্ম হয় না । সবকিছুই এই কর্মের উপর নির্ভর করে । এই মায়া রাবণ অপগুণী করে দেয় । বাবা এসে তোমাদের আবার সর্বগুণ সম্পন্ন বানান । রাম বংশী আর রাবণ বংশীদের যুদ্ধ চলতেই থাকে । তোমরা হলে রামের সন্তান । কতো ভালো ভালো বাচ্চারাও মায়ার কাছে হার খেয়ে যায় । বাবা তাদের নাম বলেন না, তবুও তিনি তাদের প্রতি আশা রাখেন । অধমের থেকেও অধমকে তো উদ্ধার করতেই হয় । বাবাকে এই সম্পূর্ণ বিশ্বের উদ্ধার করতে হবে । এই রাবণের রাজ্যে সকলেই অধম গতি প্রাপ্ত হয়েছে । বাবা তো নিজে বাঁচার আর অন্যকেও বাঁচানোর যুক্তি রোজ - রোজই বোঝান তবুও যদি নেমে যায় তাহলে অধমের থেকেও অধম হয়ে যায় । তারা তখন উপরে উঠতে পারে না । এই অধম ভাব মনের অন্তরে দংশন করতে থাকে । যেমন বলা হয় -- অন্তিম সময়ে যে যেমন স্মরণ করবে... এদের বুদ্ধিতে এই অধম ভাবই স্মরণে আসতে থাকবে ।

তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - কল্পে - কল্পে তোমরাই তো শোনো যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, জন্তু - জানোয়াররা তো আর একথা জানবে না । তোমরাই শোনো আর তোমরাই বুঝতে পারো । মানুষ তো মানুষই, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ এঁদেরও তো নাক - কান ইত্যাদি সবই আছে, তাহলে তো এঁরাও মানুষ, তাই না, কিন্তু এঁদের মধ্যে দৈবী গুণ আছে, তাই এঁদের দেবতা বলা হয় । এঁরা এমন দেবতা কিভাবে হন, তারপর কিভাবে নেমে আসেন, এই চক্রের কথা তোমরাই জানো । যারা বিচার - সাগর মন্থন করতে থাকবে, তাদেরই ধারণা হবে । আর যারা বিচার - সাগর মন্থন করবে না, তাদের বুদ্ধু বলা হবে । যারা মুরলী পড়ে তাদের বিচার - সাগর মন্থন চলতে থাকবে - এই বিষয়ে এমনভাবে বোঝাতে হবে । বাবা আশা রাখেন - এখন বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে গিয়ে অবশ্যই বুঝতে পারবে । আশা রাখা অর্থাৎ সেবার নেশা, পরিশ্রান্ত হলে চলবে না । যদি কেউ এই পাঠের অভ্যাসের পরেও অধম হয়ে যায়, তারাও যদি আবার আসে, তাহলে তাদের তো স্নেহের সঙ্গে বসাবে, নাকি বলবে চলে যাও ! তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে হবে - এতদিন কোথায় ছিলো, কেন আসে নি ? তারা তো বলবে - মায়ার কাছে হেরে গেছি । তারা বুঝতেও পারে যে, এই জ্ঞান খুবই সুন্দর । স্মৃতি তো থাকে, তাই না । ভক্তিতে তো জয় - পরাজয়ের কোনো কথাই নেই । এ হলো জ্ঞান, একে ধারণ করতে হবে । তোমরা যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ হচ্ছো, ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না । খৃস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি ইত্যাদির মধ্যে ব্রাহ্মণ হয়ই না । ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয় । এই কথা এখন তোমরাই বুঝতে পারো । তোমরা জানো যে, অল্ফ (আল্লাহ) কে স্মরণ করতে হবে । অল্ফ (আল্লাহ) কে স্মরণ করলেই এই বাদশাহী পাওয়া যায় । যখন কাউকে পাবে, তো তাকে বলো যে, অল্ফ , আল্লাহকে স্মরণ করো । অল্ফকেই উচ্চ বলা হয় । বাবাকে অল্ফ বা আল্লাহ বলা হয় । অঙ্গুলি দিয়ে অল্ফের দিকে ইশারা করা হয় । সোজা উপরে হলেন এই অল্ফ বা আল্লাহ । অল্ফকে এক বলা হয় । ভগবান হলেন একজনই, বাকি সবাই তাঁর সন্তান । বাবাকে অল্ফ বা আল্লাহ বলা হয় । বাবা যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি নিজের বাচ্চাও তৈরী করেন । তাই বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত । বাবা আমাদের কতো সেবা করেন, তিনি আমাদের এই বিশ্বের

মালিক বানান । তিনি নিজে সেই পবিত্র দুনিয়ায় আসেনও না । পবিত্র দুনিয়াতে কেউই তাঁকে ডাকেন না । পতিত দুনিয়াতেই তাঁকে ডাকা হয় । পবিত্র দুনিয়াতে এসে তিনি কি করবেন । তাঁর নামই হলো পতিত পাবন । তাই পুরানো দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানো হলো তাঁর দায়িত্ব । বাবার নাম হলো শিব । বাচ্চাদের শালগ্রাম বলা হয় । এই দুইয়েরই পুজো হয় কিন্তু যারা পূজা করেন তারা কিছুই জানেন না, ব্যস, এক রীতি - নিয়ম বানিয়ে দিয়েছে এই পুজোর জন্য । দেবীদেরও এক নম্বর হীরে - মুক্তোর প্রাসাদ ইত্যাদি বানিয়ে পূজা করা হয় । ওরা তো মাটির লিঙ্গ বানায় আর ভেঙ্গে ফেলে । এই লিঙ্গ বানাতে কোনো পরিশ্রম হয় না । দেব - দেবীর মূর্তি বানাতে পরিশ্রম হয় । শিববাবার পুজোতে কোনো পরিশ্রম লাগে না । সবকিছুই বিনা পয়সায় পাওয়া যায় । জলে পাথর ঘষা খেয়ে গোল হয়ে যায় । সম্পূর্ণ ডিমের আকার হয়ে যায় । এমনও বলা হয় যে, আত্মা হলো ডিমের মতো যা ব্রহ্ম তত্বে থাকে, তাই তাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয় । তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের এবং এই বিশ্বের মালিক হও ।

তাই প্রথমে এক বাবার সম্বন্ধে বোঝাতে হবে । শিবকে বাবা বলে সবাই স্মরণ করে । দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মাকেও বাবা বলা হয় । প্রজাপিতা যখন, তখন তো সকল প্রজাদেরই পিতা হলেন, তাই না । গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা, এখনই তোমাদের মধ্যে আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অনেকেই বলেন কিন্তু যথার্থ ভাবে কেউই জানে না । ব্রহ্মা কার সন্তান ? তোমরা বলবে পরমপিতা পরমাত্মার । শিব বাবা এনাকে দত্তক নিয়েছেন, তাই ইনি তো শরীরধারী হলেন, তাই না । সকলেই ঈশ্বরের সন্তান । এরপরে যখন শরীর ধারণ করে তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দত্তক সন্তান বলা হয় । এ কোনো দত্তক নেওয়া নয় । সমস্ত আত্মাদের কি পরমপিতা পরমাত্মা দত্তক নিয়েছেন ? তা নয়, তিনি তোমাদের দত্তক নিয়েছেন । তোমরা এখন হলে ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । শিববাবা দত্তক নেন না । সমস্ত আত্মাই অনাদি - অবিনাশী । সকল আত্মাই নিজের নিজের শরীর, নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে, যে অভিনয় তাদের করতেই হবে । এই অভিনয়ই অনাদি - অবিনাশী পরম্পরা ধরে চলে আসছে । এর আদি - অন্ত সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের অর্থ, পদ ইত্যাদির অহংকার দূর করতে হবে । অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজেকে লাভবান করতে হবে । সেবাতে কখনোই পরিশ্রান্ত হবে না ।

২) পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য মুখ থেকে সর্বদা রত্ন বের করতে হবে । দুঃখ দেওয়ার মতো বাণী যেন বের না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে । সর্বদা হাসিমুখে থাকতে হবে ।

বরদানঃ- সদা শ্রেষ্ঠ সময় অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ কর্ম করে বাঃ - বাঃ - এর গীত গাওয়া ভাগ্যবান আত্মা ভব*

এই শ্রেষ্ঠ সময় শ্রেষ্ঠ কর্ম করে "বাঃ - বাঃ" এই গান মন থেকে গাইতে থাকো । "বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম অথবা বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের শিক্ষক বাবা ।" তাই সদা বাঃ - বাঃ - এই গীত গাও । কখনো ভুল করেও দুঃখের নিদর্শন দেখেও 'হায়' শব্দ বের করা উচিত নয় । বাঃ ড্রামা বাঃ । আর বাঃ বাবা বাঃ । যা স্বপ্নেও ছিলো না, সেই ভাগ্য ঘরে বসে পেয়ে গেছি । এই ভাগ্যের নেশায় থাকো ।

স্লোগানঃ- মন - বুদ্ধিকে শক্তিশালী করে দাও, তাহলে যে কোনো অস্থির পরিস্থিতির মাঝে অচল - অটল থাকবে ।*